

‘ময়না’ প্রভৃতি এদেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য। এবং ব্যক্তিবিশেষের বৃদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে ‘ঘুঘু’-উপাধিদানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মাহুশকে যেসব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শই ভূচর এবং চতুষ্পদ, দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখি বলে নিন্দা করবার একটিমাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভৎসনা করেছেন ; কেননা, তারা বাচাল কামকারী এবং তাদের ‘দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত’— অর্থাৎ তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হল না— সেকথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন ; কেননা, পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে-ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এস্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল, একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ ; এবং তার অতিরিক্ত চারখানি পা ভূচর নয়, খেচর।

এইসব কারণে, কেবলমাত্র শব্দের সাদৃশ্য থেকে এ অনুমান করা সংগত হবে না যে, আর্ষঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাকতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখি বলে গাল দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা, তাঁর মতে বঙ্গা হচ্ছে বাঙালি, বগধা হচ্ছে মগধা এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। ‘চেরপাদা’ যে কি করে ‘চের’তে দাঁড়াল, তা বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় ‘চেরপাদা’র পা-দুখানি কেটে ফেলেই ‘চের’ খাড়া করেছেন।

‘বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা’— এই যুক্ত পদের, শুনতে পাই, সেকালে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন—

বঙ্গা + অবগধাঃ + চ + ইরপাদা

ইরপাদা অর্থে সাপ। তা হলে দাঁড়াল এই যে, বাঙালি ও বেহারিকে প্রথমে পাখি পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারিদের দিতে পারি নে। অবগধা মানে যে মাগধ, এর কোনো প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন ‘চেরপাদা’র শেষ দুই বর্ণ ছেঁটে দিয়ে ‘চের’ লাভ করেছেন, আমিও তেমনি ‘অবগধা’ শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই ‘গধা’। এইরূপ বর্ণবিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্ষঋষিদের মতে বাঙালি আদিত্যে পক্ষী, অস্ত্রে সর্প এবং ইতিমধ্যে গর্দভ।

‘অবগধা’কে ‘গধা’য় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ-কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয়

বাঙালির প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাংলায় হাতি ছিল, কিন্তু বাঙালির দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এদেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অহুমান করা অসংগত হবে না। কেননা, যদি সেকালে গাধা না থাকত তো একালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে। ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়; যথা পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি। কিন্তু গর্ভদের এরূপ কোনো নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না এবং ও জাতি যে যে-কোনো অর্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাসভকুল অপর সকল দেশের স্থায় এদেশে এখনও আছে, পূর্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদৃশ্য থেকে এরূপ অহুমান করা অসংগত হবে যে, আর্থক্সিরা পুরাকালের বাঙালিদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃতভাষায় 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যকশাস্ত্রে বৃক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালির নামও করা হয় নি। অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়, অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।

আর-একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের, এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞান-শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন; কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবত হস্ ধাতু হতে উৎপন্ন, অন্তত শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হান্ত্রসের উদ্ভেক করে, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙালিজাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৩২২

## সাহিত্যে খেলা

জগৎবিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোডঁগা, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেবদানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে আঙুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুতুল-গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোডঁগা কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড়-বড় শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি-তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যমধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে, তখন এইসব-দিকেই গত্যাত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়; বরং সত্যকথা বলতে গেলে, সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায়— উড়তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে, কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য—সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদিতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গক্ষেত্রে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাষ্ঠক্ষেত্রে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যঃ চক্ৰিশিখণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এসব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য; কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘূঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব। গান করতে গেলেই যে স্বর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রথর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন-কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির গায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরই সমান আছে। এমনকি, একথা বললেও অত্যাুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের

প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্ত সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, তা হলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজারাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

১

লেখকেরাও অবশু দলের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন; কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিতানূতন সংস্ক পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিতানৈমিত্তিক কর্ম। এমনকি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের ফানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধারণের নয়ন-মন আকর্ষণ করা যায় না, এমন কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে— মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার স্লযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষ যে খেলা দেখতে ভালোবাসে, তার পরিচয় তো আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউন-হলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক'জন যায়— আর গড়ের মাঠে ফুটবল-খেলা দেখতেই বা ক'জন যায়। অথচ একথাও সত্য যে, টাউন-হলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ— ভারত-উদ্ধার; আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটো-ছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ; কেননা, তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষ যে খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনো ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি-পাণ্ডনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা। ও-ব্যাপার সাহিত্যে চলে না; কেননা, ধর্মত জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়— স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্ত মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী

হন, যিনি কোনোরূপ কার্ধ-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না ; কেননা, খেলা হচ্ছে জীবজগতের একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ, সে সৃজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই— সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার ফুটি এবং তার ফুল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত ; কেননা, জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্তে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুম্বিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ঝাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক— এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্বষ্টি হতে পারে কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্বষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে ; সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জর্মানিরই হোক, দু দিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই ; কেননা, কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরে অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত ; কেননা, knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। ‘বিদ্যাসুন্দর’ খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা— সুবর্ণে গঠিত, স্নগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত ; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহরীর কাছে। অপরপক্ষে, এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ ; সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি সস্তা খেলনা

গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশু লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর-না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা করো না।

৪

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?— অবশ্য নয়। কেননা, কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, একথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যিক। প্রথমত, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা, শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত, অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা— শিক্ষাদান করা নয়— একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বান্দীকি আদিত্যে মুনিঋষিদের জন্তু রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্তু নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, বড়-বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ— তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমনকি কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জগ্গে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

• কাব্যরস-নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্তু দায়ী এ যুগের

স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস ; কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের রূপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চারচক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমাদের কাব্যের রূপ দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শুনি। টীকা-ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগূঢ়ত্ব জানি ; কিন্তু সে যে কি বস্তু, তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথুরে কয়লা হীরার সর্বণ না হলেও সগোত্র ; অপরপক্ষে, হীরক ও কাঁচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে ; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ বাতীত অপর-কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাঁচকে হীরা এবং হীরাকে কাঁচ বলে নিত্য ভুল করি ; এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করি নে ; কেননা, ওরূপ করা যে সংগত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শব্দচ্ছেদ করা— এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে ; একথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তা হলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এইসব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। একথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডারগাটেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হতে পারি নি।